Bangladesh Journal of Political Economy

© 2010 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 26, No. 1, June 2010, pp. 235-250
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

ট্রানজিটের রাজনৈতিক অর্থনীতি : বাংলাদেশের প্রাপ্তি

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান [১]
মো: সেলিম রেজা [২]

Abstract

This paper examines issues concerning transit among SAARC countries, particularly among Bangladesh, India, Nepal and Bhutan. After a brief introduction and stating the objectives, an attempt is made to explain the relationship between transit and development in the first part of the paper. In the second part of the paper, the historical experience in transit, probable transit routes, and the possible gains from transit for Bangladesh are discussed. In the third part, the paper analyses the progress in the preparatory works for allowing transit facilities. Here the paper expresses a great deal of optimism that Bangladesh and for that matter Chittagong has all the possibilities to emerge within 2020 as the regional hub of the East. And finally, in the concluding part, the paper makes some recommendations for speedy realization of the benefits from transit.

ভূমিকা

২০১০ সালের ডিসেম্বরে সার্কের (SAARC) পঁচিশ বছর পূর্তি হয়েছে। এ উপলক্ষে আমরা কোনও রজত জয়ন্তী উৎসব দেখতে পাই নি সদস্য দেশগুলোতে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো তথা সরকারসমূহ এ রকম কিছু ভাবছে বলেও আমরা জানতে পারি নি ।এ সুদীর্ঘ সময়েও সার্কের মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও ইন্টিগ্রেশনের ব্যাপারটি সামান্যই এগিয়েছে। আর ট্রানজিটের ব্যাপারটি তো সুদূর পরাহত ব্যাপারই রয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে সার্কের আবির্ভাব সবচেয়ে দেরীতে হলেও, আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাজনীতিবিদরা দেরীতে হলেও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে পৃথিবীর

১ অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২ প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অন্যান্য অঞ্চলের অনুরূপ সহযোগিতা সংস্থাসমূহের (ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আসিয়ান ইত্যাদি) অভিজ্ঞতার আলোকে অতি দ্রুততার সাথে সার্ককে কার্যকর সহযোগিতা সংস্থায় রূপদানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। সার্কের জনগণের সে আশা পূরণ হয় নি। এখনও আমাদেরকে ট্রানজিটের মত মামূলী বিষয় নিয়ে বিতর্কে জড়াতে হচ্ছে পরস্পরের সাথে। আশার কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমানে সার্কের প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্রেই নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে। এমনটা অতীতে কখনোই ছিল না। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ভারত যেখানে সর্বদাই গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় ছিল। সার্ক দেশসমূহের বিশেষ করে বাংলাদেশ, নেপাল, ভারত ও ভূটানের সরকারগুলো ট্রানজিট নিয়ে ইদানিং বেশ তৎপর হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যদিও ট্রানজিটের খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মধ্যে মতভিন্নতা এখনো পুরোপুরি কাটেনি, তবুও তাদের উন্নয়নের গতি বাড়াতে ট্রানজিটের বিকল্প যে নেই সে ব্যাপারে মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে কোনও মতভেদ নেই। আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০১০ সালের ১০-১২-ই জানুয়ারী ভারত সফরের সময়ে উভয় দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তির আলোকে আমরা ইদানিং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে ট্রানজিটের ক্ষেত্রে বেশ কিছু ধনাত্মক পদক্ষেপ লক্ষ্য করছি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড: মনমোহন সিং-এর আসন্ন বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে আরও ইতিবাচক ও বাস্তব পদক্ষেপের সংবাদ আমরা পাবো এ আশা করাই যায়। এ রকম একটি আশাপ্রদ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রবন্ধে তাই আমরা ট্রানজিট ও ট্রানজিট সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ট্রানজিটের মাধ্যমে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সে বিষয়ে আলোকপাত করা। আর এ মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে :

১। ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা ;
২। ট্রানজিট থেকে আমাদের দেশের প্রাপ্তির বিষয়ে অনুসন্ধান করা ;
৩। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ট্রানজিট প্রদানে আমাদের দেশের প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা ;
৪। আর ট্রানজিটের সুফল দ্রুত বাস্তবায়ণের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সুপারিশমালার আকারে উপস্থাপন করা।

পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধ রচনায় মূলত: মাধ্যমিক উৎসের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা, পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিসহ বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল ও সাময়িকীর বিভিন্ন সংখ্যা। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থা এসকাপের বিভিন্ন প্রকাশনা, বিভিন্ন গ্রন্থ এবং সাময়িকী ও দৈনিকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও প্রবন্ধের সহায়তা নেয়া হয়েছে।

১

ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের ভূখন্ড অন্য একটি দেশ বা দেশসমূহের মানুষ ও যানবাহনের যাতায়াতের জন্যে ব্যবহার করতে দেয়ার নামই হচ্ছে ট্রানজিট। যেমন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ একে অপরের উপর দিয়ে বাস, ট্রেন, ট্রাক, গাড়ী ইত্যাদি পরিবহণ মাধ্যমের সহায়তায় যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ করছে ; আবার পায়ে হেটেও কেউ চাইলে যাতায়াত করতে পারে ; একে অপরের বন্দর বা বন্দরসমূহ ব্যবহার করে আমদানী-রপ্তানীর কাজও করছে তারা। আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এ রকম ট্রানজিট সুবিধা ভোগ করছে। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আমলে স্বাক্ষরিত Inland Water Transit and Trade (IWTT) চুক্তির আওতায় শুধু জলপথে ভারত ও বাংলাদেশ ট্রানজিট সুবিধা ভোগ করে আসছে। পরবর্তীতে জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে ১৯৮০ সালে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় জলপথ ছাড়াও স্থলপথে সীমিত আকারে ট্রানজিটের অনুমতি দেয়া হয় ভারতকে। এ চুক্তির মেয়াদ শেষে বেগম খালেদা জিয়ার আমলে ২০০৬ সালে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় যা এখনও চলছে। ট্রানজিট দু'ধরনের হতে পারে : ক) আন্ত:দেশীয় ট্রানজিট , অর্থাৎ দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে ; খ) একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রদেশের মধ্যে। অন্যদিকে করিডোর হচ্ছে কোন দেশের ক্ষুদ্র ভূখন্ড যা অন্য কোন রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে কোন বন্দরে যাতায়াতের পথ হিসেবে বা কোন ছিটমহলে যাতায়াতের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন , বাংলাদেশের লালমনির হাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের তিনবিঘা করিডোর যার উপর দিয়ে আমাদের দেশের ভূখন্ড দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় (ছিটমহল) যাতায়াত করতে হয়। এটা নিয়ে ভারতের সাথে আমাদের দেশের বিরোধ রয়েছে। তবে অতীতের যেকোন সময়ের চেয়ে বর্তমানে পরিস্থিতি অনেক ভাল। কারণ অতীতে এ করিডোর মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্যে খোলা রাখা হতো। আর বর্তমানে সকাল থেকে রাত অবধি খোলা রাখা হচ্ছে। ভবিষ্যতে ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে ফ্লাইওভার নির্মাণের মাধ্যমে বলে শোনা যাচ্ছে। বৃহৎ অর্থে করিডোর ট্রানজিটেরই অংশ। প্রশ্ন হচ্ছে : ট্রানজিটের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন সম্পর্ক আছে কি? আর থাকলে তা কেমন সম্পর্ক? অবশ্যই ট্রানজিটের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক আছে এবং তা সরাসরি ; অর্থাৎ ট্রানজিট সুবিধা থাকলে বা দিলে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। উদাহরণ হিসেবে ইউরোপ, আসিয়ান, চীন-ভিয়েতনাম, চীন-উত্তর কোরিয়া, চীন-রাশিয়া, সিআইএস ও চীন-মঙ্গোলিয়ার কথা বলা যায়।

১৯৭৩ সালে ফিনল্যান্ডের রাজধানী হেলসিংকিতে স্বাক্ষরিত সর্ব ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও শান্তিচুক্তির আওতায় ইউরোপীয় দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরস্পরকে ট্রানজিট সুবিধা দিতে সম্মত হয়। এমন কি প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোও এ সুবিধা (ট্রানজিট) লাভ করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিম ইউরোপের একমাত্র বৃটেন বাদে বাকী সব রাষ্ট্রগুলোই বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে জ্বালানী সংকটে পড়ে। ফলে তারা জ্বালানীর বিশেষ করে গ্যাসের প্রায় অফুরন্তভান্ডার সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালীসহ বেশ কিছু দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি করে গ্যাস সরবরাহের জন্যে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে গ্যাস সরবরাহের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ট্রান্স সাইবেরিয়ান ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ শুরু করে। প্রায় এক দশক লেগে যায় এ গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ করতে। বিগত শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সোভিয়েত গ্যাস জার্মানী ও ফ্রান্সে পৌছে যায়। পরবর্তীতে ইতালীসহ অন্যান্য দেশে গ্যাস সরবরাহ

শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর তাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি জ্বালানীর (গ্যাসের) জন্যে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এ আশংকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা তাদের দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাইপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম (গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের জন্যে) সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে সোভিয়েতরা বাধ্য হয়ে নিজেরাই তা উৎপাদন করে এবং বিশ্বের দীর্ঘতম গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করে। সাম্প্রতিককালে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত কারণে জার্মানী বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে আরও একটি সরবরাহ লাইন নির্মাণের জন্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ওদিকে চীন এবং জাপানও সাইবেরিয়ার গ্যাস এবং তেল যথাক্রমে পাইপ লাইন ও মেগা ট্যাংকারের মাধ্যমে সরবরাহের জন্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তি করেছে। ইতোমধ্যেই চীন ও জার্মানীতে নব নির্মিত পাইপ লাইনের মাধ্যমে যথাক্রমে তেল ও গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়ে গেছে। জাপানকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) মেগা ট্যাংকারের সাহায্যে সরবরাহের জন্যে রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যে ভ্লাডিভাস্তকের নিকটে এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। আসিয়ানের দেশগুলোও পরস্পরের উপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। সিংগাপুর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সে তার ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে সিঙ্গাপুর পুন:রপ্তানী (re-export) ব্যবসা গড়ে তোলে। গড়ে তোলে অসংখ্য তেল শোধন শিল্প ও সংরক্ষণাগার। আর এভাবে পার্শ্ববর্তী মালয়েশিয়ার তেল ও রাবারসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ পুন:রপ্তানীর মাধ্যমে সিঙ্গাপুর দ্রুত উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধনের যোগান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিল (৩, ৪)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ট্রানজিট সুবিধা একটি দেশের উন্নয়নকে দারুনভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অথচ দু:খজনক হলেও সত্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার (সার্ক অঞ্চলের) দেশসমূহে এখনও আমাদেরকে ট্রানজিট নিয়ে বিতর্ক করতে হচ্ছে। সার্ক প্রতিষ্ঠার পঁচিশ বছর অতিক্রান্তহলেও (সার্ক প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৮৫ সালের ৮-ই ডিসেম্বর) এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অদ্যাবধি আস্থা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। যে কারণে প্রায়-ই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও তিক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে, এমন কি ছোট-খাটো ও তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সাফটা (South Asian Free Trade Area বা SAFTA) কার্যকর হয়েছে সেই ২০০৬ সালের ১-লা জুলাই (হওয়ার কথা ছিল ঐ বছরের পহেলা জানুয়ারী)। এ চুক্তিতে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ২০১৫ সাল নাগাদ সার্ক অঞ্চল মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় পরিণত হবে। ইতোমধ্যেই ৪ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। অথচ কাজের কাজ কিছুই হয় নি। মুক্ত বাণিজ্যের অন্যতম পূর্বশর্তই হচ্ছে উম্মুক্ত সীমান্ত ও ট্রানজিট। এ দুটো ক্ষেত্রেই বরফ এখনও গলে নি। আর এগুলোর সমাধান ছাড়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গঠন, আমরা মনে করি, শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে (৭)।

ট্রানজিটের ব্যাপারটি এখনও আতুর ঘরেই রয়ে গেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে পারস্পরিক অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও সহযোগিতার মনোভাবের অনুপস্থিতি। আর তাইতো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের দেশে এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও ট্রানজিট নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। বিএনপি, জামাতসহ পাকিস্তানপন্থী দলসমূহ ট্রানজিটের বিপক্ষে বক্তব্য রাখছে এবং আওয়ামী লীগ ও বামদলগুলোসহ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী দলগুলো এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। এর ফলে জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নেআমরা ট্রানজিটের পক্ষের যুক্তিগুলো তুলে ধারার চেষ্টা করবো।

১। অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। কারণ ট্রানজিট দিতে হলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশেষ করে রেল পথ, সড়ক পথ ও নৌ-পথের বিকাশ অত্যন্ত জরুরী। এর সাথে সাথে বিদ্যুৎ, বন্দর, সংরক্ষণাগার ও ট্রানজিট ক্যাম্পেরও বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

২। আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। করিডোর এবং চট্টগ্রাম, মঙ্গলা ও ভবিষ্যতে কুয়াকাটা ও সোনা দিয়ায় নির্মিতব্য সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের বিষয়টিকে যদি ট্রানজিটের সাথে সুসমন্বিত করা যায়, তাহলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্য, নেপাল ও ভূটান আমাদের বন্দরগুলো ব্যবহারে উৎসাহিত হবে। আর তাতে করে আমাদের দেশের ব্যবসা-বানিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। উপরোক্ত দেশগুলোর ব্যবসায়ীরা যেমন আমাদের বন্দরগুলোর মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা বিকশিত করার সুযোগ পাবে; তেমনি আমাদের ব্যবসায়ীরাও পুন:রপ্তানী (re-export) ব্যবসার সুযোগ পাবে। এ ক্ষেত্রে দু'ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হবে: ১। ঐ সকল দেশের প্রয়োজনীয় পণ্য আমাদের ব্যবসায়ীরা আমদানী করে তাদের দেশে রপ্তানী করার সুযোগ পাবে; ২। আবার ঐ সকল দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য আমাদের ব্যবসায়ীরা আমদানী করে অন্য দেশে রপ্তানী করতে পারবে। এ ছাড়াও সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে ঐ সকল দেশের প্রয়োজনীয় পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানী করার সুযোগ সৃষ্টি হবে (তুলনামূলক সুবিধার বিবেচনায় অবশ্যই)।

৩। সহায়ক অনেক সেবা খাতের বিকাশ ঘটার সম্ভাবনা। বৃহৎ অর্থে দীর্ঘ মেয়াদে ট্রানজিট সুবিধা অবশ্যম্ভাবীভাবে অসংখ্য অন্যান্য খাত-উপখাতের বিকাশে ভূমিকা রাখে। যেমন, হোটেল-মোটেল, রেষ্টুরেন্ট, বিনোদন কেন্দ্র, ব্যাংক ও বীমা, ট্যুরিজম, ইন্ডেটিং ইত্যাদি। নি:সন্দেহে এগুলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

৪। বিনিয়োগ বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। ট্রানজিট সুবিধা পাওয়ার ফলে সময় ও অর্থের বিপুল সাশ্রয়ের বিবেচনায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলো, এমন কি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও বিনিয়োগে বিশেষ করে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগে অত্যন্ত উৎসাহী হবে। ভারত, চীন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকসহ অসংখ্য দেশ ও প্রতিষ্ঠান এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। ভারত তো ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের রেলওয়ে, সড়ক ও বিদ্যুত খাতের উন্নয়নে এক বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে বাংলাদেশকে যার বাস্তবায়ন কাজ দ্রুতই এগিয়ে চলছে। ওদিকে চীনও সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণসহ আরও অনেক অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকসহ বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও দেশ পদ্মাসেতু নির্মাণ, রেলের আধুনিকায়ণ ও সম্প্রসারণ, চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়ককে চার লেনে উন্নীতকরণ, ঢাকায় এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে (শাহ্জালাল বিমানবন্দর থেকে ডেমরা পর্যন্ত ২৬ কি:মি: দৈর্ঘ্য) ও পাতাল রেল (উত্তরা-ফুলবাড়িয়া) নির্মাণে বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে। এ ধরনের মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে অবশ্যই আমাদের জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূরীকরণে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নি:সন্দেহে।

৫। বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসের সম্ভাবনা। ট্রানজিট সুবিধা পুরোদমে চালু হলে ভারতের সাথে আমাদের দেশের এখনকার প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি (১৫,১৬) অনেকটাই কমে আসবে। কারণ বাংলাদেশ তখন ফি, শুল্ক, ভ্যাট, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদির আকারে বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বাড়ানোর সুযোগ পাবে। আর ভারতের জন্যেও তা সময় ও অর্থের আকারে অনেক সাশ্রয়ী হবে। বর্তমানে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলো ও পশ্চিম বঙ্গ থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে (সেভেন সিষ্টার্স) পৌছাতে একমাত্র শিলিগুড়ি চিকেন নেক করিডোর ব্যবহার করতে হয়। আর এতে ২০০০ থেকে ৩০০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি

দিতে হয়। আর রেল লাইনের অপ্রতুলতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সড়ক পথে বাস-ট্রাক ব্যবহার করতে হয়। অথচ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পাড়ি দিলে মাত্র ৪০০-৬০০ কিলোমিটার অতিক্রম করলেই চলবে। আর ট্রেন সার্ভিস পুরোদমে চালু হলে তো কথাই নেই। গোটা প্রক্রিয়াটি আরও সাশ্রয়ী হবে।

৬। বহুমুখী ট্রানজিট (বন্দর ও করিডোরসহ) সুবিধা বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিবে অনেক গুণে। শুধু দ্বিপক্ষীয় নয় বহুপক্ষীয়, অর্থাৎ ট্রানজিট প্রক্রিয়ায় শুধু ভারত ও বাংলাদেশ নয়, নেপাল, ভূটান ও চীনকে যদি সম্পৃক্ত করা যায়, তাহলে আমাদের দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। এ বিষয়ে ভারত, নেপাল ও ভূটান ইতোমধ্যেই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে। চীনও অদূর ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। কাজেই দীর্ঘ মেয়াদে ট্রানজিট যে বহুপাক্ষিক হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

৭। আমাদের দেশের দরকষাকষির শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাংলাদেশের ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থানের কারণে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান আমাদের দেশের উপর ভারত, নেপাল, ভূটান ও চীনের নির্ভরশীলতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেবে। এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই শুভ সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, ভারতের আমাদের দেশের সাথে সীমান্ত সমস্যা সমাধানে কাজ শুরু, তিন বিঘা করিডোরের উপরে ফ্লাইওভার নির্মাণের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান রাস্তা সার্বক্ষণিক ব্যবহারের সুযোগ দিতে সম্মতি, নেপাল ও ভূটানকে ট্রানজিট দিতে ভারতের সম্মতি, সড়ক ও রেল পথে মিয়ানমার হয়ে চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ গুয়াংডং-এর সাথে যোগাযোগের জন্যে মিয়ানমার অংশে প্রয়োজনীয় সড়ক ও রেলপথ নির্মাণে সেদেশের সরকারকে রাজী করাতে চীনের ভূমিকা গ্রহণ ইত্যাদি।

৮। সাদফ (South Asian Development Fund বা SADF) ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি। সদস্য রাষ্ট্র ভূটানের প্রস্তাবে ১৯৯১ সালের ২১-শে ডিসেম্বর শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সার্ক সম্মেলনে এ ফান্ডটি গঠিত হয়। অদ্যাবদি এ ফান্ডের টাকায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সুতরাং সার্কের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসমন্বিত বহুপাক্ষিক ট্রানজিট সুবিধা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের কাজে অবশ্যই এ তহবিলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

অপরদিকে ট্রানজিটের বিরুদ্ধপক্ষের যুক্তিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। জাতীয় নিরাপত্তা ভীতি। ট্রানজিট দিলে ভারত বাংলাদেশের উপর দিয়ে সেভেন সিষ্টার রাজ্যসমূহে সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম পরিবহণ করার কাজে লাগাবে এবং এভাবে সেখানকার উপজাতীয়দের বিদ্রোহ দমনের কাজে লাগাবে। আর তাতে প্ররোচিত হয়ে আমাদের দেশের উপজাতীয়রাও বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে পারে।

২। সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পালিয়ে থাকা ভারতীয় বিদ্রোহীদের ধরতে ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ঘাটি গেড়ে বসতে পারে যা আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নের মুখোমুখি করতে পারে।

৩। ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট অমীমাংসিত সমস্যার উপস্থিতি। ট্রানজিট বিরোধী পক্ষ ভারতকে আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে বড়ভাই সুলভ আচরণের দোষে দোষী সাব্যস্ত করতে ছাড়ছেন না। কারণ

তাদের মতে ভারত তার প্রতিবেশীদের সাথে ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট অমীমাংসিত সমস্যাসমূহের সমাধানে মোটেও আন্তরিক নয়। বরং সে ক্রমান্বয়ে তাদের উপর কর্তৃত্ববাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে আগ্রহী। আর এমন অবস্থায় (অমীমাংসিত সমস্যাসমূহ জিয়ে রেখে) ট্রানজিট দিলে ভারত বৃটিশদের মত প্রভুর ভূমিকায় আসীন হয়ে যেতে পারে।

৪। চীন-ভারত যুদ্ধের সম্ভাবনা। ভারতের অরুণাচল রাজ্যকে চীন এখনও তাদের ভূখন্ড বলে মনে করে। কাজেই অরুণাচল রাজ্যকে দখলে নিতে গিয়ে চীন-ভারত যুদ্ধ সত্যিই সত্যিই লেগে গেলে ভারত নিশ্চয়ই ট্রানজিট সুবিধাকে সামরিক তথা সৈন্য ও সামরিক রসদ সরবরাহের সহজ রুট হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। আর তখন আমাদের দেশ ইচ্ছের বিরুদ্ধেই এ যুদ্ধে জড়িয়ে যেতে পারে।

৫। মাদক পাঁচার সমস্যা। ট্রানজিট বিরোধীরা যুক্তি দেখাচ্ছেন যে, ট্রানজিট দিলে মাদক ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে। কারণ আমাদের দেশের অবস্থান হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা বিখ্যাত তিনটি মাদক পাঁচার রুটের (১। গোল্ডেন ট্রায়াংগেল; ২। গোল্ডেন ক্রিসেন্ট; ৩। গোল্ডেন ওয়েজ) মধ্যখানে।

৬। ট্রানজিট রুটগুলোর নিয়ন্ত্রণ সমস্যা। হরতাল, ধর্মঘট, ঘেরাও এবং জ্বালাও-পোড়াও এর মত রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির বাংলাদেশের পক্ষে ভারতীয় ট্রানজিট যানবহরের নিরাপত্তা বিধান ও সময়-সূচী রক্ষা অত্যন্ত দূরুহ এবং ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে বলে তাদের ধারণা।

৭। অবৈধ বাণিজ্য হারানোর আশংকা। বর্তমানে বাংলাদেশী পণ্য অবৈধ পথে সেভেন সিষ্টার্সে ঢুকে পড়ছে সহজেই। কারণ পশ্চিম বঙ্গসহ ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলো থেকে পণ্য আনা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। কাজেই ট্রানজিট চালু হলে আমাদের দেশের উপর দিয়ে স্বল্প সময়ে এবং সর্বনিম্ন খরচে সেভেন সিষ্টার্সে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের পণ্যসমূহ পরিবাহিত হবে এবং বাংলাদেশের চোরাকারবারীরা ব্যবসা হারাবে বলে ট্রানজিট বিরোধীদের আশংকা।

৮। পরিবেশগত ক্ষতির সম্ভাবনা। ট্রানজিট বিরোধীদের একটা অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে যে, ট্রানজিট দিলে স্থল ও নৌ-পথে যান্ত্রিক যানবাহণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে যা নানা ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনবে আমাদের দেশের জন্যে।

২

ট্রানজিটের অভিজ্ঞতা এবং সম্ভাব্য পথসমূহ

বৃটিশ আমল থেকেই আমাদের এ অঞ্চলে ট্রানজিট ভিত্তি পায়। ১৮৪৭ সালে বৃটিশরা তাদের প্রয়োজনে এখানে নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তখন থেকেই তারা নিয়মিতভাবে আসাম থেকে কোলকাতায় চাসহ অন্যান্য পণ্য পরিবহণ করতো। ১৯৪৭ সালের পর বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারত-পকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত IWTT চুক্তির আওতায় তিনটি ট্রানজিট রুট গড়ে ওঠে যা ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ ছিল এবং নিয়মিতভাবে এ রুটসমূহে নৌ-পথে পণ্য ও যাত্রীবাহী যান চলাচল করতো। রুটগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১। ধুবরী(আসাম)-চিলমারী-গোয়ালন্দ-চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ-ভৈরববাজার-ছাতক-জকিগঞ্জ সীমান্ত(আসাম) ;
২। ধুবরী(আসাম)-চিলমারী-চাঁদপুর-বরিশাল-মোলারহাট-খুলনা-বিহারী খাল(ভারত) ; ধুবরী(আসাম) ;
৩। গোদাগাড়ী(রাজশাহী)-গোয়ালন্দ-চাঁদপুর-ছাতক-জকিগঞ্জ সীমান্ত (আসাম) ।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলের সেই IWTT চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করা হয় ১৯৭২ সালের ২৮-শে মার্চ। তবে এবারে রুট সংখ্যা চারে উন্নীত করা হয় এবং উভয় দিকে যাতায়াতের ব্যবস্থা রাখা হয়। রুটগুলো হচ্ছে :

১। কোলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-চালনা-খুলনা-বরিশাল-নন্দীবাজার-চাঁদপুর-আরিচা-সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ চিলমারী- ধুবরী(আসাম) ;

২। কোলকাতা-হলদিয়া-রায়মঙ্গল-মংলা-কাউখালী-বরিশাল-নন্দীবাজার-চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ-ভৈরব-বাজার আজমিরিগঞ্জ- মারকুলী-শেরপুর-ফেঞ্চুগঞ্জ-জকিগঞ্জ-করিমগঞ্জ(আসাম) ;

৩। গোদাগাড়ী (রাজশাহী)-ধুলিয়ান (ভারত) ;

৪। করিমগঞ্জ-জকিগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ-শেরপুর-মারকুলী-আজমিরিগঞ্জ-ভৈরব বাজার-আরিচা-সিরাজগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ- চিলমারী- ধুবরী(আসাম) ।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নাব্যতা সংকটের কারণে নৌপথে ট্রানজিট বর্তমানে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। আর বৃটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত কোলকাতা-আসাম ও চট্টগ্রাম-আসাম রেল ট্রানজিট ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই নৌপথের অপর্যাপ্ততার কারণে স্থল পথের গুরুত্ব বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত বেশী। স্থল পথের মধ্যে আবার রেল পথের সীমাবদ্ধতার কারণে ভারত বছরে সড়ক পথে চিকেন নেক করিডোর দিয়ে প্রায় ১০ মিলিয়ন টন পণ্য পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলো থেকে সেভেন সিষ্টার্সে পাঠায় এবং রেলের মাধ্যমে প্রায় ৪ মিলিয়ন টন (১৭)। পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে যে, ভারতের জন্যে এটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। কাজেই ভারত অবশ্যই চাচ্ছে যে, বাংলাদেশ তাকে ট্রানজিট দিয়ে সহযোগিতা করুক। তবে আমাদের ধারণা যে, ট্রানজিট দিলেও পুরো পণ্যই আমাদের দেশের মধ্য দিয়ে সেভেন সিষ্টার্সে যাবে না। কারণ উত্তর প্রদেশসহ পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলো থেকে পণ্য দূরত্বের বিবেচনায় চিকেন নেক করিডোর (শিলিগুড়ি) হয়েই সেভেন সিষ্টার্সে ঢুকবে। সেক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাস যে, ১০ মিলিয়ন টনের মত পণ্য আমাদের দেশের রুটগুলো ব্যবহার করে সেভেন সিষ্টার্সে যাবে। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে রুটগুলো কত দ্রুত চালু করা যায় এবং কত আধুনিক হবে তার উপর। আমাদের দেশের ভেতর দিয়ে সম্ভাব্য আন্ত:রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক (শুধু ভারতের জন্যে নয়) ট্রানজিট রুটগুলো (দূরত্বসহ) হতে পারে নিম্নরুপ:

১। পেট্রাপোল (ভারত সীমান্ত)-বেনাপোল (বাংলাদেশ সীমান্ত)-লালনশাহ সেতু-বঙ্গবন্ধু সেতু-তমাবিল বাংলাদেশ সীমান্ত) -মেঘালয়(ভারত সীমান্ত) [৬৮৬ কি: মি:];
২। পেট্রাপোল -বেনাপোল -লালনশাহ সেতু-বঙ্গবন্ধু সেতু-আখাউড়া (বাংলাদেশ সীমান্ত)-আগরতলা (ভারত সীমান্ত) [৭৩৭ কি: মি:],
৩। পেট্রাপোল -বেনাপোল -লালনশাহ সেতু-বঙ্গবন্ধু সেতু-চট্টগ্রাম-বিলোনিয়া (ভারত সীমান্ত) [৫৩০ কি: মি:];

৪। সিন্দাবাদ (ভারত সীমান্ত)-রোহনপুর (বাংলাদেশ সীমান্ত)-বঙ্গবন্ধু সেতু-তমাবিল-মেঘালয় [৭৬৩ কি: মি:] ;
৫। সিন্দাবাদ-রোহনপুর-বঙ্গবন্ধু সেতু - আখাউড়া-আগরতলা [৪১৬ কি: মি:];
৬। সিন্দাবাদ-রোহনপুর-বঙ্গবন্ধু সেতু - চট্টগ্রাম-বিলোনিয়া [৪৮০ কি: মি:];
৭। বালুর ঘাট (ভারত)-হিলি (বাংলাদেশ)-বঙ্গবন্ধু সেতু-তমাবিল-মেঘালয় (ভারত) [৬৫০ কি: মি:];
৮। বালুর ঘাট -হিলি -বঙ্গবন্ধু সেতু-আখাউড়া-আগরতলা [৪০৪ কি: মি:];
৯। বালুর ঘাট -হিলি -বঙ্গবন্ধু সেতু-চট্টগ্রাম-বিলোনিয়া [৬৩০ কি: মি:];
১০। ফুলবাড়ী (ভারত)-বাংলাবন্ধা (বাংলাদেশ)-বঙ্গবন্ধু সেতু-তমাবিল-মেঘালয় (ভারত) [৮৭৬ কি: মি:];
১১। ফুলবাড়ী-বাংলাবন্ধা-বঙ্গবন্ধু সেতু-আখাউড়া-আগরতলা [৬২৭ কি: মি:];
১২। ফুলবাড়ী-বাংলাবন্ধা-বঙ্গবন্ধু সেতু-চট্টগ্রাম-বিলোনিয়া [৭৭০ কি: মি:];
১৩। ফুলবাড়ী-বাংলাবন্ধা-বঙ্গবন্ধু সেতু-চট্টগ্রাম বন্দর [৮২৫ কি: মি:];
১৪। ফুলবাড়ী-বাংলাবন্ধা-লালনশাহ সেতু-মংলা বন্দর [৭৫০ কি: মি:];
১৫। মেঘালয়-তমাবিল-চট্টগ্রাম বন্দর [৩৫০ কি: মি:];
১৬। আগরতলা-আখাউড়া-চট্টগ্রাম বন্দর [২০০ কি: মি:];
১৭। বিলোনিয়া-চট্টগ্রাম বন্দর [১০০ কি: মি:]।

আমরা মনে করি যে, সবগুলো রুটই সাশ্রয়ী, তবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প দূরত্বের পথগুলো বেশী সাশ্রয়ী হওয়ায় ভারতের জন্যে বেনাপোল-আখাউড়া, রোহনপুর-আখাউড়া, হিলি-তমাবিল ও হিলি-আখাউড়ার মত রুটগুলো বেশী লাভজনক হবে। অন্যদিকে ভূটান ও নেপালের জন্যে ফুলবাড়ী-বাংলাবন্ধ-লালনশাহ সেতু-মংলা বন্দর রুটটি অধিক লাভজনক হবে। তবে মংলা বন্দরের সীমাবদ্ধতার কারণে এ দেশগুলো সকল বিবেচনায় আপাতত: ফুলবাড়ী-বাংলাবন্ধ-বঙ্গবন্ধু সেতু-চট্টগ্রাম বন্দর রুটটি ব্যবহারে আগ্রহী হবে বলে মনে হয়।

ট্রানজিটের ব্যয়

পণ্যবাহী যানবাহণের গন্তব্যের বিভিন্নতার কারণে আসলে ব্যয় বা খরচ হিসেব করা বেশ জটিল। তবে এক হিসেবে দেখা গেছে যে, কোলকাতা থেকে সেভেন সিষ্টার্সে প্রতি টন-কি: মি: পণ্য পরিবহণে বিদ্যমান অবস্থায় নৌ, রেল ও সড়ক পথে খরচ পড়ছে যথাক্রমে ০.২৫, ০.৮৫ ও ১.৫৭ রুপী (বাংলাদেশী টাকায় যথাক্রমে ০.৩০, ১.০২ ও ১.৮৮ টাকা)। অথচ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে সড়ক পথে ঐ একই পরিমান পণ্য পরিবহণে খরচ পড়ছে মাত্র ১.১৯ টাকা, অর্থাৎ প্রায় ৪০% কম চিকেন নেক করিডোর হয়ে পরিবহণের তুলনায় (১৭)। সময়ের দিক থেকেও ভারত লাভবান হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কারণ বাংলাদেশের ভূখন্ড ও বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পেলে ভারতের পশ্চিম থেকে পূর্বে পণ্য ও যাত্রী পাড়াপাড় এবং চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সেভেন সিষ্টার্সরা আমদানী-রপ্তানীর কাজ করে নিজেদের উন্নয়নের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারবে। বর্তমানে তাদেরকে কোলকাতা বন্দর ব্যবহার করতে হচ্ছে আমদানী-রপ্তানীর কাজে। এতে ত্রিপুরাকে সর্বোচ্চ ১,৬৫০ কি: মি: এবং আসামকে সর্বনিম্ন ১,৪০০ কি: মি: পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। অথচ চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করলে তাদেরকে গড়ে মাত্র ৪০০ কিলোমিটারের মত পথ অতিক্রম করতে হবে। অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করলে তাদের আমদানী-রপ্তানীর খরচ গড়ে প্রায় চার গুণ কমে যাবে।

রুটসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত ব্যয়

বিদ্যমান অবস্থায় সম্ভাব্য ১৭টি রুটের (বন্দর ব্যবহারসহ) মধ্যে সিংহ ভাগই চলাচল উপযোগী আছে। তবে কিছু কিছু জায়গায় সংস্কার করলেই চলবে। আর আখাউড়া নৌ বন্দর থেকে আগরতলা পর্যন্ত রাস্তার নির্মাণ কাজ তো ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। তবে ভবিষ্যতে সকল সড়ককেই চারলেনে উন্নীত করতে হবে। অপরদিকে রেল লাইনেরও সংস্কার, সম্প্রসারণ এবং মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত প্রদত্ত ১ বিলিয়ন ডলার ঋণের একটা বড় অংশ সড়ক ও রেল পথের উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে। কাজেই অর্থের কোন সমস্যা হবে না। সরকারও মনে হচ্ছে বেশ তৎপর। আর ভারতীয় অংশে রাস্তা ঘাট ভালই আছে বলে মনে হচ্ছে। তবে রেল লাইনের ঘাটতি আছে; অর্থাৎ সব গন্তব্যে এখনও রেল লাইন গড়ে ওঠে নি। এখানে উলেখ্য যে, আসাম, মেঘালয়, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা আমাদের দেশের সীমান্ত লাগা হওয়াতে ওগুলোতে ট্রাফিক গন্তব্যসমূহ বেশ কাছেই অবস্থিত (২০-৫০ কি: মি: দূরত্বে)। মনিপুর ও নাগাল্যান্ডের অবস্থান সর্বোচ্চ ১০০ কি: মি: হবে এবং অরুণাচলের দূরুত্ব ১০০ কি: মি: এর বেশী হবে; তবে তা ১৫০ কি: মি: ছাড়াবে না। অন্যদিকে বাংলাবন্ধা থেকে ভারত, নেপাল ও ভূটানের গন্তব্যস্থানগুলোর দূরত্ব ৩০ থেকে সর্বোচ্চ ২০০ কিলোমিটারের মধ্যে থাকবে বলে আমাদের ধারণা।

বাংলাদেশ সরকারের সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তর সূত্রের তথ্য মতে ট্রানজিট দিলে রুটগুলোর রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামত খরচ ৩০ থেকে ৫০% বৃদ্ধি পেতে পারে, অর্থাৎ প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ মিলিয়ন টাকা প্রয়োজন হবে। এর সাথে যোগ হবে নতুন দু'টি ফিডার সড়ক নির্মাণের ব্যয়: গাজীপুর-নরসিংদী ৫০ কি: মি: ফিডার সড়ক এবং টাঙ্গাইল-ভৈরব ১৫০ কি: মি: বাই-পাস সড়ক। উক্ত সূত্র মতে এ দু'টো নির্মাণে ব্যয় হবে যথাক্রমে ১,৫০০ ও ৯,০০০ মি: টাকা (আশা করা যায় ভারতের ঋণের টাকায় এ দুটো প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে)। আর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত খরচের অন্তত: ৫০% ভারতের কাছ থেকে এবং নেপাল ও ভূটানের কাছ থেকে যথাক্রমে ২০% ও ১০% আদায়ের ব্যবস্থা সম্বলিত চুক্তি থাকতে হবে। বাকী ২০% বাংলাদেশ বহণ করবে। তবে ট্রান্সশিপমেন্টের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে হবে (ট্রান্সশিপমেন্ট হচ্ছে ট্রানজিট প্রদানকারী দেশের ভেতরে তার যানবাহণ ব্যবহার করার বাধ্যবাধকতা)। কারণ এ ক্ষেত্রে আমাদের যানবাহণের জন্যে তাদেরকে অবশ্যই ভাড়া দিতে হবে।

বাংলাদেশের প্রাপ্তি

ট্রানজিট থেকে আমাদের দেশ বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারে। সম্ভাব্য প্রাপ্তি বা বেনিফিটকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : ক) প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি; খ) পরোক্ষ প্রাপ্তি। প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির উৎসগুলো হচ্ছে :

১। বার্ষিক ট্রানজিট ফি বা রয়ালটি;
২। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের জন্যে ফি বা চার্জ;
৩। পণ্য শুল্ক ও কর;
৪। সেতু ও ফেরীর টোল;
৫। পরিবহণ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেবার চার্জ।

পরোক্ষ প্রাপ্তির উৎসগুলো হচ্ছে :

১। সড়ক, সেতু ও রেল লাইনের বিকাশ, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন;
২। নদী ড্রেজিং ও বন্দরের বিকাশ, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন;
৩। বিনিয়োগ (দেশী ও বিদেশী) বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি;
৪। সেবাধর্মী বিভিন্ন ধরণের কর্মকান্ডের বিকাশ;
৫। ট্যুরিজম ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের বিকাশ;
৬। কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা।

ট্রানজিট প্রদানের জন্যে পণ্য-কিলোমিটার বা যাত্রী-কিলোমিটারের ভিত্তিতে একটা নির্দ্দিষ্ট ফি আরোপ করা যেতে পারে অথবা বার্ষিক ভিত্তিতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রয়ালটি আরোপ করা যেতে পারে। বর্তমানে নৌ পথে ট্রানজিটে এ রকম একটা ব্যবস্থা চালূ আছে। ১৯৭২ সালের IWTT চুক্তি অনুযায়ী ভারত নৌ ট্রানজিটের জন্যে রয়ালটি হিসেবে বাংলাদেশকে বাৎসরিক ৫০ মি: টাকা দিয়ে আসছে। তবে ২০১০-১১ অর্থ বছরের বাজেটে প্রবর্তিত বিধান অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০১০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের পণ্যবাহী দু'টি জাহাজের উপর শুল্ক আরোপ করলে ভারতীয়রা ১৯৭২ সালের উপরোক্ত চুক্তির দোহাই দিয়ে তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এক পর্যায়ে এ নিয়ে দুদেশের সরকার পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে শুল্ক আরোপ না করার সিদ্ধান্ত হয়। তবে বাংলাদেশ সরকার নতুন বৃহত্তর ট্রানজিটের সম্ভাবনা এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে ট্রানজিটে ফি, রয়ালটি, শুল্ক, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ আইনের খসড়া প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মন্ত্রণালয় , গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও ট্যারিফ কমিশনের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কোর কমিটি গঠন করেছেন। এ কমিটি ইতোমধ্যে তাদের কাজ শুরু করেছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই তারা এ বিষয়ে একটি সুসমন্বিত নীতি উপহার দিতে সক্ষম হবেন। পরিবর্তিতে এ খসড়া নিয়ে ভারত, নেপাল ও ভূটানের সাথে আলোচনা করে আইনটি চূড়ান্ত করতে হবে।

প্রত্যক্ষ আর্থিক প্রাপ্তি বিষয়ে অদ্যাবধি কোনও বিশ্বাসযোগ্য ও পরিপূর্ণ গবেষণা আমাদের জানামতে হয় নি। যা কিছু হয়েছে তা অনেকটাই অনুমান নির্ভর ; তবে ভিত্তি অবশ্যই আছে বলে আমরা মনে করি। কোন কোন হিসাব মতে, ট্রানজিট দিলে আমাদের বার্ষিক নীট আয় হবে ৫৯ বিলিয়ন টাকা বা ৮৬০ মি: ডলার (১৭)। উপরোক্ত হিসেবে অবশ্য নেপাল ও ভূটানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তারা এটাকে এভাবে দেখেছেন: বর্তমানে চিকেন নেক করিডোর (শিলিগুড়ি) ব্যবহার করে ভারতের বার্ষিক খরচ হচ্ছে প্রায় ১০০ বিলিয়ন রূপী। যদি এর অর্ধেক পরিমান বাংলাদেশের উপর দিয়ে যায়, তাহলে আমাদের আয় হবে ৫০ বিলিয়ন রূপী বা প্রায় ৬০ বিলিয়ন টাকা। এর সাথে যুক্ত হবে সেতু ও রাস্তার টোল এবং ফেরীর চার্জ বাবদ প্রায় ১ বিলিয়ন টাকা। তার মানে মোট আয় দাঁড়াচ্ছে ৬১ বিলিয়ন (৬০+০১) টাকা। এ থেকে বার্ষিক খরচ বাবদ প্রায় ২ বিলিয়ন টাকা (রুট মেরামত ৫০০ মি:+রুট সংস্কার ও সম্প্রসারণ ৫০০মি:+নিরাপত্তা খরচ ১০০০ মি:) বাদ দিলে নীট আয় দাঁড়ায় ৫৯ বি: (৬১-০২) টাকা। আরও অনেকে অনেক রকম হিসেব কষেছেন। কিন্ত সেগুলো আমাদের কাছে তেমন নির্ভরযোগ্য ও বাস্তবসম্মত মনে হয় নি (১৭)। আমরা আশা করি বর্তমান সরকার গঠিত কমিটি এ ব্যাপারে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবসম্মত হিসাব আমাদের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবেন। অপর দিকে পরোক্ষ প্রাপ্তিটাও আমাদের জন্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি মনে করি এটা আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরোক্ষ প্রাপ্তির উৎসগুলো আসলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি।

৩

দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক ট্রানজিট সংশ্লিষ্ট কাজের অগ্রগতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ট্রানজিট নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, কাজ হয় নি। এমনকি বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে; কিন্তু অগ্রগতি খুব সামান্যই। ট্রানজিটের রুটগুলোতে সড়ক ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক, অপ্রশস্ত ও নিম্নমানের। একমাত্র ব্যতিক্রম বিশ্বরোডের কিছু অংশ যা বিদেশীরা নির্মাণ করেছে। রেলের অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। বাংলাদেশ রেলওয়ে লাইনের স্বল্পতা, সরঞ্জামের অভাব, লোকবলের অপ্রতুলতা ইত্যাদি নানান সমস্যায় জর্জরিত। অতীতের সরকারগুলোর বিশেষ করে সামরিক সরকারগুলোর অদূরদর্শী পদক্ষেপের কারণেই রেলে এ রকম দূরাবস্থা (৮)। ওদিকে নৌ পথের অবস্থা আরও খারাপ। অতীতের সরকারগুলোর অবহেলাই এ জন্যে দায়ী (৬)। বর্তমান সরকার সড়ক, রেল ও নৌপথের সংস্কার, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের জন্যে এক বিশাল কর্মজজ্ঞ হাতে নিয়েছে।

ইতোমধ্যেই পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার সীমান্তবর্তী বাংলাবান্ধা স্থল বন্দরের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য শুরু হয়েছে। বিগত ২২-শে জানুয়ারী ২০১১ তারিখ, শনিবার, ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জি ও বাংলাদেশের কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এ স্থল বন্দরের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। এর পূর্বে এ বন্দরের কাষ্টমস ও ইমিগ্রেশনসহ যাবতীয় অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়। সাথে সাথে ৪ লেনবিশিষ্ট সুপ্রসস্ত রাস্তা নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে। ভারত, নেপাল ও ভূটানের অত্যন্ত কাছাকাছি হওয়ায় ঐ সকল দেশের চাহিদা নির্ভর শিল্প-কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তারা এ বন্দরের পাশাপাশি প্রায় সব জমি কিনে ফেলেছে। ফলে বর্তমানে সেখানে জমির দাম গগনচুম্বী। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখান থেকে ভারতের শিলিগুড়ির দূরত্ব মাত্র ৫ কি: মি:, জলপাইগুড়ির ১০, দার্জিলিং এর ৫৮, নেপালের কাঁকরভিটার ৬১ এবং ভূটানের ফুয়েন্টসিলিং এর মাত্র ৬৮ কি: মি:। অতি শীঘ্রই ইমিগ্রেশন কর্মকান্ড শুরু হবে। আর তা হলে এ পথে শুধু মালামাল পাড়াপাড়ই নয়, সংশ্লিষ্ট দেশের নাগরিকরা এবং ঐ সকল দেশে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকরা নিশ্চয়ই এ সহজ ও সংক্ষিপ্ত রুটে আমাদের দেশের সমুদ্রসৈকত কক্সবাজার, কুয়াকাটাসহ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি সুন্দরবন ও পার্বত্যাঞ্চল দর্শনে আগ্রহী হবে। ওদিকে বেনাপোল স্থল বন্দরের আধুনিকায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আখাউড়া নৌবন্দরের সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কাজ শুরু হয়েছে। আখাউড়া থেকে ত্রিপুরার সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক প্রসস্তকরণ ও আধুনিকায়নের কাজও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আর চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। খুলনা থেকে মংলা বন্দর পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ এবং কক্সবাজার থেকে টেকনাফ হয়ে মিয়ানমারের ঘুণদুম পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের কাজও শুরু হতে যাচ্ছে শীঘ্রই। তাছাড়া মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরের আধুনিকায়নের কাজ দ্রুত আগাচ্ছে। সরকার নৌপথকে সারা বছর নাব্য বা সচল রাখার জন্যে নদী ড্রেজিং-এর এক মহাকর্মজজ্ঞ হাতে নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর সংলগ্ন কর্ণফুলী ও পশুর নদী ড্রেজিং এর কাজ শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। স্বল্প মেয়াদে সরকার ব্যক্তিগত খাতের সহায়তায় ভর্তুকী মূল্যে ২০১১ সালের মধ্যে প্রায় ৩০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের চুক্তি করেছে যার মধ্যে ১০০০ মেগাওয়াট ইতোমধ্যেই জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। মধ্য মেয়াদে সরকারী ও বেসরকারী খাত মিলিয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে আরও ৭০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাগেরহাটে ১৩২০ মেগাওয়াটের

কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কারখানা নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। চট্টগ্রামে অনুরূপ একটি কারখানা নির্মাণের প্রক্রিয়াও শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে। এ ছাড়াও বিবিয়ানায়, সিরাজগঞ্জ ও মেঘনা ঘাটে আরও তিনটি ডুয়েল ফুয়েল (গ্যাস ও তেল) বিদ্যুৎ উৎপাদনের কারখানা নির্মাণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এগুলোর বেশীর ভাগই পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের আওতায় নির্মিত হতে যাচ্ছে। দীর্ঘ মেয়াদে ঈশ্বরদীর রূপপুরে ১০০০ মেগাওয়াটের ২টি পারমানবিক চুল্লী সম্বলিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে। এ বছরেই মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর মস্কো সফরের সময় পুরো চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। তারপরেই নির্মাণ কাজ শুরু হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ১ম ইউনিট স্থাপিত করা হবে। পরবর্তীতে ২য় ইউনিট স্থাপিত হবে। ২০২০ সালের মধ্যে স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ ছাড়াও ভারত , নেপাল , ভূটান ও মিয়ানমার থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের ব্যাপারে সমঝোতা হয়েছে। ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির উদ্দেশ্যে গ্রীড লাইন ও সাব-ষ্টেশন (ভেড়ামারা ও বহরমপুর) স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যেই অনেক দূর এগিয়েছে। আশা করা হচ্ছে ২০১২ সাল থেকে সরবরাহ পাওয়া যাবে। স্থল ও সমুদ্র বন্দরের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। কুয়াকাটায় দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং বুড়িমারী (লালমনির হাটে), ভোমরা (সাতক্ষীরায়) ও হিলি (দিনাজপুরে) স্থল বন্দর আধুনিকায়নের কাজও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায় যে, ট্রানজিট প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম গতি পাচ্ছে, তবে তা আরও গতিশীল করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

প্রাচ্যের উন্নয়ন কেন্দ্র চট্টগ্রাম

প্রশ্ন হচ্ছে চট্টগ্রাম উন্নয়নের কেন্দ্র হতে পারে কি না। আমরা মনে করি ইতোমধ্যেই চট্টগ্রাম বাংলাদেশের উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রাচ্যের কেন্দ্র হতে তাকে আর একটু আগাতে হবে এই আর কি। চট্টগ্রামের ভৌগোলিক কৌশলগত অবস্থান অচিরেই তাকে এ অবস্থানে উত্তরণে সাহায্য করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের মৌলিক ও ভারী শিল্পের অর্ধেকই চট্টগ্রামে অবস্থিত ; পোষাক ও অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রায় একই অবস্থান তার। বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর, যার মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রায় ৮০% আমদানী-রপ্তানীর কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। কক্সবাজার ও তিনটি পার্বত্য জেলা (রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি) তো প্রাকৃতিক সৌন্দয্যের লীলাভূমি। এগুলোর রয়েছে অফুরন্ত উন্নয়ন সম্ভাবনা, যার কানাকড়িও আমরা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। চট্টগ্রামকে প্রাচ্যের উন্নয়নের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা একান্তই জরুরী :

প্রথমত : ৫০ থেকে ১০০ বছরের চাহিদা (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক) মাথায় রেখে একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। অন্য কথায়, বর্ণিত সময়ে কি কি উন্নয়ন কাজ করতে হবে তার একটা রূপরেখা এ পরিকল্পনায় থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত : চীন ও ভারতের আদলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলতে হবে। এটা অবশ্য গোটা বাংলাদেশের জন্যে প্রযোজ্য। চীন এখন তাদের শহরগুলোকে জ্ঞান নির্ভর (Knowledge-based) শহর হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছে। বেইজিং ও সাংহাইতে এ কাজ ইতোমধ্যেই অনেক দূর এগিয়েছে। এখন তারা প্রদেশিক রাজধানীগুলোকে এভাবে গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছে। গুয়াংডং (Guangdong) প্রদেশকে তারা ইতোমধ্যে জ্ঞান নির্ভর প্রদেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ঘোষণা

করেছে। এ কাজকে তারা সুদূর তিববত পর্যন্ত বিস্তৃত করার পরিকল্পনা করেছে। চীনে ইতোমধ্যে শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। দক্ষ শ্রম শক্তির মধ্যে উচ্চতর বেতনের জন্যে ঘনঘন কাজ বদলানোর প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কাজেই এ সমস্যা সমাধানে তারা শ্রমঘন বাদ দিয়ে মূলধনঘন উৎপাদনে যাচ্ছে। এখানেই নিহিত রয়েছে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির মূল রহস্য। চট্টগ্রামে আইটি পার্ক, মেরিন পার্ক, জাহাজ নির্মাণ পার্ক ইত্যাদিকে ভিত্তি করে বেশ কিছু বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা সম্ভব।

তৃতীয়ত : তিন পার্বত্য জেলাকে এবং কক্সবাজারকে বিশেষ সংরক্ষিত অঞ্চল ঘোষণা করতে হবে। এখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নিষিদ্ধ করতে হবে। এখানে হবে শুধু পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র। এখানে স্বাস্থ্যনিবাস বা স্যানাটোরিয়াম গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তুলতে পারলে উপরোক্ত উপ-খাতগুলো থেকে শিল্পায়নের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী আয় হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

চতুর্থত : কক্সবাজারে বিশেষ করে টেকনাফ ও সেন্টমার্টিনে থাইল্যান্ডের ব্যাংককের আদলে মেরিন পার্ক গড়ে তুলতে হবে , যেখানে সামুদ্রিক সকল প্রাণির পরিচিতিসহ বিশাল বিশাল এ্যাকুয়ারিয়াম থাকবে। কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে হবে (অত্যাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ)। আর এ সব করতে পারলে দীর্ঘ মেয়াদে চট্টগ্রাম অবশ্যই প্রাচ্যের কেন্দ্রভূমি বা হাব হিসেবে পরিচিতি পাবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

৪

সুপারিশমালা

১। ট্রানজিট চুক্তি অবশ্যই বহুপাক্ষিক ও সুসমন্বিত হতে হবে। অর্থাৎ এর সাথে সাথে আমাদের দীর্ঘ দিনের সমস্যাগুলোর সমাধান করে নিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আমলে ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির (মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি) আলোকে সীমান্ত সমস্যা ও ছিটমহল সমস্যার সমাধান স্থায়ীভাবে করতে হবে। ৫৪টি নদীর পানি বন্টন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে হবে। এর পরে আসছে বঙ্গোপসাগরে জলসীমা নির্ধারণের ব্যাপারটি, যেটি এখন জাতিসংঘের আর্বিট্রেশন আদালতে আছে। আমরা মনে করি জাতিসংঘের নির্দেশনার (রায়ের) আলোকে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে এ ব্যাপারে সমঝোতা করে একটা স্থায়ী সমাধানে আসতে হবে। কোন মতেই সমস্যা জিয়ে রাখা যাবে না। কারণ তাহলে ট্রানজিটের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে না।

২। ট্রানজিট চুক্তি অবশ্যই বহুপাক্ষিক হওয়া উচিৎ। আগামী ৫০-১০০ বছরে কি কি পরিবর্তন আসতে পারে তা মাথায় রেখে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। কারণ ভারত , নেপাল ও ভূটানের যেমন আমাদের দেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট প্রয়োজন, আমাদেরও তেমনি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে ঐ সকল দেশের উপর দিয়ে অনুরূপ ট্রানজিট প্রয়োজন হবে বিশেষ করে চীনে যাওয়ার জন্যে। অন্যদিকে চীনেরও প্রয়োজন হবে উপরোক্ত দেশগুলোর উপরদিয়ে আমাদের দেশে প্রবেশের জন্যে ট্রানজিট সুবিধা। ইতোমধ্যেই চীনারা ভারতের সিকিম ও নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত সড়ক পথ নির্মাণ করে ফেলেছে। এখন তারা রেল পথ নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। এছাড়াও তিববতে তারা ৫টি আন্তর্জাতিক মানের বিমান বন্দর স্থাপন করছে, যার মধ্যে দু'টি ইতোমধ্যেই

চালু হয়েছে (১৪,১৫,১৬)। এসবের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে প্রবেশ করা, যা চীনের বিশেষ করে তিববত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে দ্রুততর করবে।

৩। ট্রানজিটের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। নিষিদ্ধ পণ্য যেমন, মাদকদ্রব্য, আগ্নেয় অস্ত্র, বোমা ইত্যাদি এবং এর সাথে সাথে জঙ্গি ও অপরাধি অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা (স্ক্যানার ইত্যাদি) সরঞ্জাম দ্বারা সজ্জিত করতে হবে প্রবেশ ও প্রস্থানের বন্দরগুলোকে। অপরাধীদের ধরতে আন্তদেশীয় হেলিকপ্টার স্কোয়াড গঠন করা যেতে পারে।

৪। ট্রানজিটের আইনগত, প্রশাসনিক এবং কারিগরি বিষয়গুলোর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আসিয়ানের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ চুক্তি করার ক্ষেত্রে খুবই উপকারে আসতে পারে।

৫। সবশেষে আমাদের দেশের সাথে ভারতের বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতার বিষয়, সীমান্তে নিরাপত্তাবাহিনী কর্তৃক নিরীহ মানুষ হত্যা, ট্রানজিট থেকে উদ্ভূত পরিবেশগত সমস্যা ইত্যাদি বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনায় নিতে হবে। এগুলোর সমাধান না করে ট্রানজিট চালু করলে তা কখনই টেকসই তথা স্থায়ী রূপলাভ করবে না বলে আমাদের বিশ্বাস।

উপসংহার

পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। সার্কও এগিয়ে যাচ্ছে, তবে সময়ে যতটা, উন্নতিতে ততটা নয়। সার্কের দেশগুলো এখনও নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্প বাণিজ্য করে (৭, ১০, ১১)। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সিংহ ভাগই হচ্ছে সার্ক বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলোর সাথে। অথচ আসিয়ান ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্ধেক বাণিজ্য করে নিজেদের মধ্যে। আর এটা সম্ভব হয়েছে ট্রানজিটের জন্যেই। দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যতও নিহিত আছে ট্রানজিটের মধ্যে। ট্রানজিট প্রদানের মাধ্যমে আমরা পরস্পরের উন্নয়নকে প্রভাবিত করতে পারি, পারি দক্ষিণ এশিয়ার ভাগ্যাহত মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাতে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে। বলা হচ্ছে একুশ শতাব্দী এশিয়ার তথা চীনের। এমনি এমনি তো আর এটা বলা হচ্ছে না। এর ভিত্তি আছে। আর তা হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। গোটা পৃথিবীতে মহাদেশ বিবেচনায় এশিয়ার প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ এবং এর পেছনে চীনের ভূমিকা সর্বোচ্চ। ২০১০ সালেও চীনের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.৩%। বিগত তিন দশক যাবত চীন দু' অংকের ঘরে ছিল প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে। আমরা কি সেরকমটা চাই না? নিশ্চয়ই চাই। আর তা হলে আসুন ট্রানজিট নিয়ে সকল বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সামনে এগিয়ে যাই। বদলে ফেলি দক্ষিণ এশিয়াকে। দিন বদলের এখনই সময়।

গ্রন্থপঞ্জী

১। অর্থ মন্ত্রনালয়, গণপ্রাজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০।

২। পরিসংখ্যান ব্যুারো, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় : পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ ২০০৯।

৩। Antipov V.I : Singapore. Misl, Moscow, 1982 (in Russian).

৪। Kurzanov V.N. : Industrial development of Singapore. Nauka, Moscow,1978

৫। খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন : বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মংলা সমুদ্র বন্দরের ভূমিকা। Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 25, Nos. 1&2, 2009.

৬। খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন : বাংলাদেশের পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে নৌ-পরিবহণে ভূমিকা। Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 24, Nos. 1&2, 2008.

৭। খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন : ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন : প্রেক্ষিত দক্ষিণ এশিয়া। Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 23, Nos. 1&2, 2006.

৮। খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন : বাংলাদেশে অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে : সমস্যা ও সম্ভাবনা। Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 22, Nos. 1&2, 2005.

৯। খান মো: মোয়াজ্জেম হোসেন : বাংলাদেশের বিদ্যুতায়ন : সমস্যা ও সম্ভাবনা। আই.বি.এস.জার্নাল, সংখ্যা ১৪০৬ : ৭, এপ্রিল ২০০০, ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১০। Khan M. Moazzem Hossain : Trade between Bangladesh and other SAARC countries : Some Pertinent Issues. বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সাময়িকী , ২য় খন্ড , ২০০৭।

১১। Khan M. Moazzem Hossain : Problems and Prospects of Trade Expansion between Bangladesh and other SAARC countries. In the International Seminar Volume titled "Recent Trends of Economic Reforms in SAARC Region", International Institute of Development Studies (IIDS), Kolkata, India, 1998.

১২। Khan M. Moazzem Hossain : Role of the Power Sector in the Development of Economic Infrastructure of Bangladesh. Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. XIV, No. 2, 1998.

১৩। Rahmatullah M.: Asian Land Transportation Development: Its Implications for Trade and Economic Growth for Bangladesh, Background Paper of CPD arranged Dialogue, 04-05 January 1997.

১৪। দৈনিক সমকাল, ঢাকা।

১৫। দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা।

১৬। Daily Star, Dhaka.

১৭। Internet.